INTERNATIONAL PEER-REVIEWED RESEARCH JOURNAL OF SATYA RANJAN COLLEGE (IPRJSRC)

A Peer-Reviewed Multidisciplinary Multilingual Research Journal

E-ISSN: _____ P-ISSN: _____

DOI: _____

Volume I, Issue I, November 2026, Page No: 08-14

Published by Satya Ranjan College, Kalain, Cachar, Assam, India

Website: https://srcjournal.org/

ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্প: লোক উপাদানের আলোকে বিশ্লেষণ

Dr. Gautam Das

Assistant Professor, Patharkandi College, Sribhumi, Assam, India

Abstract

This article examines the nature and significance of various folk elements used in Bibhutibhushan Bandyopadhyay's Puimacha, Tarashankar Bandyopadhyay's Daini, and Manik Bandyopadhyay's Halud Pora. The primary objective of the study is to identify and analyse folk beliefs, folk customs, superstitions, supernatural elements, and the consciousness of rural life represented in these selected stories. It also seeks to determine how these folk elements contribute to the development of the plot, setting, and characters.

Following primarily analytical and comparative approaches, the study identifies different folk elements and analyses their social, cultural, and literary significance. At the outset, the concept and characteristics of folk elements are briefly discussed. Subsequently, folk beliefs, superstitions, folk customs, supernaturalism, reflections of rural life, and the literary application of these elements in the three stories are examined systematically. The study also considers the differences in the representation of folk life through the individual perspectives of the three authors.

The analysis reveals that folk elements in these stories are not merely devices for creating an authentic rural setting; rather, they play a significant role in expressing the psychological states of characters, social relationships, life philosophies, and the underlying thematic concerns of the narratives. The selected stories deeply reflect the realities of rural society and folk life. In this respect, they may be regarded as valuable literary documents of the representation of folk elements in Bengali fiction.

Keywords: Folk beliefs, Superstitions, Rural life, Supernaturalism, Folk elements, Folk culture, Folk traditions

লোক উপাদান বলতে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত কৃষ্টি, সংস্কৃতি, বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান ও সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে বোঝায়। এটি কোন একক ব্যক্তির সৃষ্টি নয়; সমষ্টির ধারাবাহিক মানসের বহিঃপ্রকাশ। অর্থাৎ লোকজীবনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশই হল লোক উপাদান। লোক জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য মৌখিকতা। এটি অলিখিত এবং মানুষের মুখে মুখে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়। দ্বিতীয়ত এটি কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির একক সৃষ্টি নয়, সমাজের বহু মানুষের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, অভ্যাস ও চিন্তার ফসল। তৃতীয়ত দেশ কাল ও পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে সাথে এর রূপ অনেকটা পরিবর্তিত হয়ে যায়। চতুর্থত এর ভাষা সহজ-সরল, সাবলিল ও আঞ্চলিক শব্দবহুল যা সাধারণ মানুষ সহজে বুঝতে পারে। এছাড়াও লোক উপাদানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রকৃতি নির্ভরতা। লোক উপাদানের সঙ্গে নদী, মাটি, বৃষ্টি এবং পশুপাখির এক গভীর সংযোগ থাকে।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ' এ ও লোক উপাদানের ব্যবহার স্পষ্ট। আর মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্য পুরোপুরি লৌকিক দেবী ও গ্রামীণ জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। 'মৈমনসিংহ গীতিকা' তথা 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র মধ্যে বাংলা সাহিত্যের অমূল্য লোক উপাদানের ব্যবহার বহুলভাবে দেখা যায়। ছোটদের নানা ছড়াতেও লোক উপাদানের ব্যবহার দেখা যায়। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের রূপকথার বই 'ঠাকুরমার ঝুলি' বাংলা সাহিত্যে লোক উপাদানের জীবন্ত দলিল। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর উপকথার গল্পগুলি ও এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য। আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লোকগীতি ও বাউল গান দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর অনেক গান, নাটক ও কবিতায় লোক উপাদানের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কথাসাহিত্যিকদের গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি রচনায় ও লোক উপাদানের প্রাচুর্য লক্ষণীয়।

বাংলা সাহিত্যে তথা কথাসাহিত্যে লোক উপাদানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। লোকবিশ্বাস, লোকাচার, কুসংস্কার, অলৌকিকতা ইত্যাদি সাহিত্যে শুধু পরিবেশ নির্মানের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। এগুলির মাধ্যমে মানুষের মনোজগৎ, সামাজিক সম্পর্ক ও জীবন চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। এই প্রেক্ষাপটে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুঁইমাচা' তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডাইনি' এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হলুদ পোড়া' গল্প তিনটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। 'পুঁইমাচা' গল্পে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের জীবন ও সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে লোকজ বিশ্বাস ও জীবনচেতনার সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। 'ডাইনি' গল্পে গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও অলৌকিকতার ধারণা মানুষের জীবন ও সামাজিক সম্পর্ককে কিভাবে প্রভাবিত করে, তার তাৎপর্যপূর্ণ প্রকাশ ঘটে। আবার 'হলুদ পোড়া' গল্পেও লোকবিশ্বাস সংস্কার ও গ্রামীণ মানুষের মানসিকতার বিভিন্ন দিক কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এ কারণেই আলোচ্য তিনটি গল্পকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে লোক উপাদানের ব্যবহার, প্রকৃতি ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছি। এবারে বিভূতিভূষণের 'পুঁইমাচা' গল্পে লোক উপাদান নিয়ে আলোচনা করব।

(ক) পুঁইশাক ও পুঁইমাচা গ্রামীণ জীবনের অংশ: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'পুঁইমাচা' গল্পে পুঁই শাক ও পুঁই মাচা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে উপস্থিত। পুঁইমাচা এখানে একটি শুধু শাকসবজি উৎপাদনের স্থান নয়; এটি গ্রামের মানুষের দৈনন্দিন জীবন, খাদ্যাভাস এবং অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে যুক্ত। দরিদ্র পরিবারের কাছে সামান্য শাকসবজিও প্রয়োজনীয় খাদ্য ও জীবনধারনের অবলম্বন হয়ে ওঠে। ফলে পুঁইমাচাকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ বাংলার স্বাভাবিক জীবনযাত্রার একটি বাস্তব চিত্র এখানে পাওয়া যায়।

(খ) ক্ষেন্তি চরিত্র ও প্রান্তিক গ্রামীণ জীবন: গল্পের ক্ষেন্তি চরিত্রটির মধ্য দিয়ে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের জীবনযাপন ও লুকোজ সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রকাশিত হয়েছে। তার জীবন অভাব-অনটনে ঘেরা হলেও খাবার, প্রকৃতি ও সংসারের ছোটখাটো প্রয়োজনের সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক আছে। ক্ষেন্তির মতো চরিত্রের দৈনন্দিন আচরণে বোঝা যায়, গ্রামীন সমাজপ্রকৃতি ও গৃহস্থালির উপকরণ কিভাবে মানুষের জীবনধারণের সঙ্গে মিশে আছে। ক্ষেন্তির প্রতি পরিবারের সদস্যদের আচরণেও গ্রামীণ সমাজের সমাজের পারিবারিক সম্পর্ক, স্নেহ, শাসন ও সামাজিক মূল্যবোধের প্রকাশ দেখা যায়।

(গ) গ্রামীন খাদ্য সংস্কৃতি: 'পুঁইমাচা' গল্পে পুঁইশাক, চিংড়ি এবং বিভিন্ন ঘরোয়া খাবারের উল্লেখ গ্রামীণ বাংলার খাদ্য সংস্কৃতিকে স্পষ্ট করে। পুঁইশাকের ডাঁটা বা পাতা নষ্ট না করে তা সংগ্রহ করে রান্নায় ব্যবহার করার মধ্যে দরিদ্র পরিবারের বাস্তব জীবনচিত্র ফুটে ওঠে। খাদ্য অপচয় না করে সামান্য উপকরণ দিয়েই সংসারের

প্রয়োজন মেটানোর প্রবণতা গ্রামীণ লোকজ জীবনের একটি বৈশিষ্ট্য। ফলে খাদ্য সংস্কৃতি মধ্য দিয়ে গ্রামীণ পরিবারের জীবন ও আবেগের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

(ঘ) পৌষ সংক্রান্তি ও পিঠেপুলির সংস্কৃতি: গল্পে পৌষ সংক্রান্তি ও পিঠে পুলির প্রসঙ্গ গ্রামীণ বাংলার লোক উৎসব ও খাদ্য সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। চালের গুঁড়া, ময়দা ও গুড় দিয়ে পিঠে তৈরির আয়োজন করা হয়। এই ঘরোয়া আয়োজনের মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, গ্রামীণ মানুষের কাছে উৎসব মানে শুধু সামাজিক অনুষ্ঠান নয়। পরিবারের সদস্যদের একত্রিত হওয়াও বটে। পৌষ পার্বণকে কেন্দ্র করে পরিবারের নারীদের ব্যস্ততা, শিশুদের আগ্রহ এবং ঘরোয়া পরিবেশ সবমিলিয়ে গল্পে বাংলার লোকজ উৎসব সংস্কৃতির একটি স্বাভাবিক ছবি ফুটে উঠেছে এই গল্পে।

(ঙ) গ্রামীণ প্রকৃতি ও লোকজ পরিবেশ: বিভূতিভূষণের রচনায় প্রকৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 'পুঁইমাচা' গল্পেও শেওড়া, বেঁশডাট, রংচিতা- সহ বিভিন্ন গাছপালা, পাখি, কুকুর ঝোঁপঝাড় ইত্যাদি গ্রামীণ পরিবেশ নির্মিত হয়েছে। এসব উপাদান নিছক প্রকৃতির বর্ণনা নয়; চরিত্রগুলির জীবনযাত্রার সঙ্গে এগুলির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। গ্রামীণ মানুষের কাছে পুকুর, গাছপালা, বন, ঝোঁপ, ও মাঠ দৈনন্দিন জীবনের অংশ। ফলে গল্পের প্রকৃতি একই সঙ্গে লোকজীবন ও মানসিকতার পরিবেশ তৈরি করেছে।

(চ) লোকজ ভয় ও রহস্যবোধ: গল্পে গ্রামীণ প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত কিছু শব্দ দৃশ্য মানুষের মনে রহস্যের অনুভূতি সৃষ্টি করে। অন্নপূর্ণা দুর্গার সঙ্গে যাওয়ার সময় ঘরের বা আশপাশের নির্জন পরিবেশ থেকে অদ্ভুত শব্দ শুনতে পান। আবার রাতের পরিবেশে পাখির ডাক, ঝোঁপঝাড় ও জ্যোৎস্নার বর্ণনাও একটি রহস্যময় আবহ তৈরি করে। এই ধরনের পরিবেশ গ্রামের লোকজ মানসিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত। যেখানে প্রকৃতির অচেনা শব্দ ও অন্ধকারকে ঘিরে বড় কৌতুহল ও নানা কল্পনার জন্ম হতে পারে। তাই প্রকৃতির বর্ণনার মধ্যেও লোকজ অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে।

(ছ) বিবাহ ও সামাজিক রীতিনীতি: 'পুঁইমাচা'য় গ্রামীণ সমাজের বিবাহ প্রথা ও অন্যান্য সামাজিক রীতি-নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। মেয়ের বয়স, পাত্র নির্বাচন, পরিবারের আর্থিক সামর্থ্য এবং সমাজের মতামত সবকিছুই বিবাহের সঙ্গে যুক্ত। এই প্রসঙ্গে সমাজের প্রবীণ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এখানে, বিবাহ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের পরিবর্তে অনেকাংশে সমাজ নির্ভর একটি বিষয়। এর মধ্য দিয়ে গ্রামীণ সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে।

(জ) দারিদ্র পীড়িত সমাজের চিত্র: 'পুঁইমাচা'য় লোকজ জীবনচিত্রের সঙ্গে দারিদ্র ও অভাব গভীরভাবে যুক্ত। অল্প পয়সার সংসার চালানো, শাকপাতা ও অন্যান্য সহজলভ্য উপাদান সংগ্রহ করা এবং দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য স্থানীয় সম্পদের উপর নির্ভর করা- এসবের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ মানুষের জীবন সংগ্রাম প্রকাশিত হয়েছে। অতএব, গল্পে লোকজ সংস্কৃতি শুধু উৎসব, খাদ্য প্রকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; অভাবের মধ্যে বেঁচে থাকার কৌশল ও এই লোকজ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

(ঝ) লোকসমাজ ও পারিবারিক সম্পর্ক: গল্পের সহায়হরি, অন্নপূর্ণা, ক্ষেন্তি, দুর্গা, পুঁটি প্রমুখ চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ পরিবারের কাঠামো ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রকাশিত হয়েছে। সহায়হরির সহানুভূতিশীল মনোভাব এবং অন্নপূর্ণার সংসারকেন্দ্রিক বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও উভয়ের আচরণই সেই সময়ের গ্রামীণ পারিবারিক বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত। ক্ষেন্তির মতো দরিদ্র ও অসহায় চরিত্রের প্রতি সমাজের আচরণ থেকেও সামাজিক শ্রেণীবিভাজন ও আর্থিক বৈষম্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

(ঞ) লোক উপাদানের তাৎপর্য: সব মিলিয়ে পুঁই মাচা গল্পে পুঁইশাক ও পুঁইমাচা, গ্রামীণ খাদ্যসংস্কৃতি, পৌষ সংক্রান্তি ও পিঠে পুলি, গ্রামীণ প্রকৃতি, বিবাহরীতি, পারিবারিক সম্পর্ক, দারিদ্র ও লোকজ মানসিকতা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রামীণ জীবনচিত্র নির্মাণ করেছে। বিশেষত, ক্ষেন্তির মতো চরিত্রের জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে এই লোকজ বাস্তবতা আরো মানবিক ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অতএব, 'পুঁইমাচা'য় লোকজ উপাদান কোনো বিচ্ছিন্ন অলংকার নয়- বিভূতিভূষণ এই উপাদানগুলিকে ব্যবহার করে বাংলার গ্রামীণ সমাজের একটি সহজ স্বাভাবিক ও মানবিক চিত্র তুলে ধরেছেন ।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডাইনি' গল্পেও বিভিন্ন ভাবে লোক উপাদান ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সূত্রাকারে বিষয়টি পর্যালোচনা করা যাক -

(ক) ডাইনি পরিচিতি ও লোকবিশ্বাস: 'ডাইনী' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র একজন বৃদ্ধা, যাকে গ্রামের মানুষ ডাইনি বলে মনে করে । এই ডাইনি সংক্রান্ত বিশ্বাস লোকসংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কোন ব্যক্তির অস্বাভাবিক আচরণ নিঃসঙ্গতা বা সামাজিক বিচ্ছিন্নতাকে কেন্দ্র করে কিভাবে লোকসমাজে তাকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী মনে করা হয়, গল্পটি তার একটি শক্তিশালী উদাহরণ।

(খ) ছাতি-ফাটার মাঠ ও লোককথা: গল্পের শুরুতেই ছাতি-ফাটার মাঠকে ঘিরে একটি লোককথার উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রামের নিরক্ষর মানুষেরা বিশ্বাস করে অতীতকালে এক মহানাগ সেখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। সেই নাগের বিষের কারণেই নাকি মাঠে উর্বরতা নষ্ট হয়ে যায়। তাই মহানগরের কাহিনী নিছক প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা নয়; এটি গ্রামীণ মানুষের লোককল্পনা ও বিশ্বাসের মাধ্যমে প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা প্রকাশ করে।

(গ) অশুভ দৃষ্টি ও 'নজর' বিশ্বাস: গল্পে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লোকউপাদান হলো নজর লাগা বা অশুভ দৃষ্টির বিশ্বাস। হারু সরকার মনে করে তার ছেলের অসুস্থতার জন্য বৃদ্ধা ডাইনি দায়ী। বৃদ্ধা যখন আম দিয়ে মুড়ি খাওয়া শিশুটিকে দেখে, তখন হারু সরকার তাকে অভিযুক্ত করে যে সে তার ছেলেকে নজর দিয়েছে। বৃদ্ধার মনে এই ঘটনাটি গভীরভাবে দাগ কাটে। এখানে লেখক দেখিয়েছেন যে লোকবিশ্বাস শুধু সমাজের অন্য মানুষকে প্রভাবিত করে না; যার বিরুদ্ধে বিশ্বাসটি প্রয়োগ করা হয়, তার নিজের মনকেও তা আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে।

(ঘ) শিবতলা, তারাদেবীতলা ও লোকধর্ম: গল্পে বুড়োশিবতলা ও তারাদেবীরতলার উল্লেখ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৃদ্ধার অতীত স্মৃতির সঙ্গে বুড়োশিবতলার সম্পর্ক রয়েছে। অন্যদিকে, প্রতি চতুর্দশীকতে তারাদেবীর পূজা ও বলিদান এর প্রসঙ্গ গল্পে এসেছে। বৃদ্ধা নিজেও তথাকথিত ডাইনি পরিচয় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানত করে। এই অংশে লোকধর্ম, দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস, মানত, পূজা, বলিদান- সবকিছু মিলিয়ে গ্রামীন ধর্মবিশ্বাসের এক গুরুত্বপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়।

(ঙ) লোকবিশ্বাস ও মাতৃত্ব: যখন এক অপরিচিত যুবতী মা তার অসুস্থ শিশুকে নিয়ে বৃদ্ধার কাছে জল চায়, বৃদ্ধা তাকে স্নেহের সঙ্গে জল ও পাটালি দেয়। শিশুটিকে দেখে তার তথাকথিত ডাইনিসত্তা জেগে উঠে- তার মনে হয় সে যেন শিশুটিকে খেয়ে ফেলবে। কিন্তু একই সঙ্গে তার মধ্যে মমতা ও মানবিকতাও কাজ করে। পরবর্তীকালে শিশুটির মৃত্যু হলে গ্রামের মানুষের বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয় যে বৃদ্ধা ডাইনি তার শিশুকে খেয়ে ফেলেছে।

(চ) বাণমারা: লোকচিকিৎসা ও যাদুবিশ্বাস: গল্পের শেষাংশে বাউরি সম্প্রদায়ের একটি ছেলেকে বৃদ্ধা ডাইনি বাণ মেরেছে- এই বিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ে। ছেলেটির পায়ে একটি হাড়ের টুকরো বিঁধলে পর তার স্বাভাবিক

অসুস্থতাকে রোগ হিসাবে না দেখে ডাইনির অশুভ শক্তির ফল হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়। এখানে বাণমারা একটি গুরুত্বপূর্ণ লোকবিশ্বাস। এরপর একজন গুনিন এসে ছেলেটিকে সুস্থ করে দেওয়ার কথা বলে। কোন অস্বাভাবিক অসুস্থতা বা আকস্মিক শারীরিক বিপর্যয়ের কারণ হিসাবে অদৃশ্য শক্তি বা তন্ত্র-মন্ত্রের প্রভাবকে দায়ী করার যে প্রবণতা গ্রামীণ সমাজে দেখা যায়, গল্পে তারই প্রকাশ ঘটেছে।

(ছ) গুনিন ও মন্ত্রশক্তির বিশ্বাস: ডাইনি গল্পের শেষ দিকে গুনীন চরিত্রটির উপস্থিতি লোকজ সংস্কৃতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিককে সামনে আনে। গ্রামের মানুষ বিশ্বাস করে গুনিন মন্ত্রের সাহায্যে ডাইনির অশুভ শক্তির মোকাবিলা করতে পারে। শেষ পর্যায়ে বৃদ্ধা ডাইনির মৃত্যুকে লোকসমাজ সাধারণ মৃত্যু হিসাবে দেখে না। বিশ্বাস করা হয় গুনিনের মন্ত্র প্রহারে সে আকাশ পথে পালানোর সময় পঙ্গু হয়ে পড়ে গিয়ে গাছের ডালে বিদ্ধ হয়ে মারা যায়। অর্থাৎ গল্পের শেষ পর্যন্ত ডাইনি, বান,গুনিন ও মন্ত্রশক্তি- এই সমস্ত লোকবিশ্বাস পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

(জ) গুজব ও লোকমুখে বিশ্বাসের বিস্তার: গল্পে লোক উপাদানের সবচেয়ে শক্তিশালী দিক হলো গুজবের সামাজিক শক্তি। কোন ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান না করে গ্রামের মানুষ ঘটনাগুলিকে বৃদ্ধা ডাইনির সঙ্গে যুক্ত করে। একটি শিশুর অসুস্থতা, আরেকটি শিশুর মৃত্যু, বাউরি ছেলেটির অসুস্থতা- প্রতিটি ঘটনাই তার বিরুদ্ধে নতুন প্রমাণ হিসাবে ব্যবহৃত হয় ।ফলে ব্যক্তিগত একটি ঘঠনা ধীরে ধীরে সমষ্টিগত লোকবিশ্বাসে পরিণত হয়। গ্রামের মানুষ তাকে ভয় করে, শিশুরা তাকে দেখলে পালায় এবং শেষ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ মূলক মনোভাব ও তৈরি হয়।

(ঝ) ডাইনি ভীতির সামাজিক প্রভাব: ডাইনি হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার ফলে বৃদ্ধা সম্পূর্ণভাবে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সে গ্রামের মানুষের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখতে পারে না। ভিক্ষা করতে গেলেও মানুষ তাকে ভয় করে বেশি পরিমাণে চাল দিয়ে বিদায় করে। অর্থাৎ তার প্রতি মানুষের দানও আসলে ভয় থেকে উৎসারিত। শিশুরা তাকে দেখে পালিয়ে যায়, কেউ কেউ চিৎকারও করে। বৃদ্ধা নিজেও মানুষের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলে। এভাবে লোকো বিশ্বাস কিভাবে একজন মানুষকে সামাজিকভাবে একঘরে করে দেয়, গল্পটি তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

(ঞ) লোক উপাদানের তাৎপর্য: 'ডাইনী' গল্পে মহানগরের লোককথা, ডাইনি বিশ্বাস, নজর লাগা, বুড়োশিবতলা, তারাদেবীর পূজা, মানত, বলিদান, বাণমারা, গুনিন ও মন্ত্রশক্তি- এসব লোক উপাদান একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রামীণ লোকবিশ্বাসের জগৎ তৈরি করেছে। তবে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এই লোকবিশ্বাসকে শুধু কুসংস্কার হিসাবে দেখাননি, তিনি দেখিয়েছেন অজ্ঞতা, ভয়, গুজব, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা কিভাবে একজন সাধারন মানুষকে ডাইনি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হলুদ পোড়া' গল্পেও বিভিন্নভাবে লোক উপাদানগুলো সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। কিভাবে সেই উপাদানগুলো রয়েছে তা আমাদের বিচার্য বিষয়। সূত্রাকারে বিষয়টি একটু স্পষ্ট ধারণা নেওয়া যাক।

(ক) খুনকে কেন্দ্র করে লোকবিশ্বাস ও গুজব সৃষ্টি: 'হলুদ পোড়া' গল্পের শুরুতেই পরপর দুটি খুনের ঘটনা গ্রামবাসীর মনে গভীর ভয় ও কৌতূহলের সৃষ্টি করে। প্রথমে বলাই চক্রবর্তীকে ঘোষদের মজাপুকুরের ধারে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। কয়েকদিন পর শুভ্রা নামের এক যুবতীকে গলাটিপে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। দুটি খুনের মধ্যে কোন কোন সম্পর্ক না থাকলেও গ্রামের মানুষ নিজেদের মত করে কল্পনা করে অনুমান ও গুজব বানাতে থাকে। এই প্রবণতা গ্রামীণ লোকসমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে।

(খ) ভূত পেত্নী ও অশরীরীতে বিশ্বাস: গল্পে দামিনী চরিত্রটির আচরণকে কেন্দ্র করে অশরীরী শক্তির ধারণা আরো প্রবল হয়ে ওঠে। এক সন্ধ্যায় দামিনী বাড়ির পিছন দিকে যাওয়ার সময় হঠাৎ অস্বাভাবিক আচরণ করতে শুরু করে। এই ঘটনাকে স্বাভাবিক শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতা হিসাবে না দেখে গ্রামের মানুষ মনে করে দামিনীর উপর কোন অশরীরী শক্তি ভর করেছে। এভাবে ভূত, পেত্নী, অশরীরী শক্তির ধারণা গ্রামীণ মানুষের ব্যাখ্যার প্রধান কারণ হয়ে ওঠে।

(গ) কুঞ্জগুনিন ও ঝাড়ফুঁকের, চিকিৎসা: গল্পে লোকজ সংস্কৃতির একটি অন্যতম প্রতিনিধি হল কুঞ্জগুনিন। দামিনীর অস্বাভাবিক আচরণে যখন সবাই ডাক্তার ডাকতে ব্যস্ত, তখন বুড়ো ঘোষাল আধুনিক চিকিৎসার পরিবর্তে কুঞ্জকে ডাকার পরামর্শ দেন। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ বুড়ো ঘোষালের মতের সঙ্গে একমত হয়। এখানে কুঞ্জগুনিন গ্রামীণ সমাজের লোকজ চিকিৎসা ও ঝাড়ফুঁক, নির্ভর বিশ্বাসব্যবস্থার প্রতীক।

(ঘ) হলুদ পোড়ানো-লোকাচারের কেন্দ্রীয় উপাদান: গল্পের নামের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লোকজ উপাদানটি নিহিত যা হল হলুদ পোড়ানো। আগুনে কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে তার ধোঁয়া দামিনীর নাকের কাছে ধরে। এরপর দামিনীর চেতনা ও আচরণে পরিবর্তন ঘটে এবং সে নিজেকে শুভ্রা বলে পরিচয় দেয়। এখানে হলুদ লোকজ আচার ও অলৌকিক চিকিৎসার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই কারণেই 'হলুদ পোড়া' গল্পের শিরোনামটি কেবল একটি বস্তু বা ঘটনার নাম নয় এটি সমগ্র গল্পের লোকবিশ্বাস নির্ভর মানসিকতার প্রতীক।
(ঙ) মৃতের আত্মা ভর করার বিশ্বাস: হলুদ পোড়ানোর পর দামিনী নিজের পরিচয় শুভ্রা বলে এবং দাবি করে যে বলাই চক্রবর্তী তাকে হত্যা করেছে। এই ঘটনার পর গ্রামের মানুষের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয় যে শুভ্রার আত্মা দামিনীর শরীরে ভর করেছে। বুড়ো ঘোষালের মতে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একজন মৃত মানুষের আত্মা অন্যের ক্ষতি করার ক্ষমতা অর্জন করে না। নির্দিষ্ট সময় ও শ্রাদ্ধ শান্তির সঙ্গে আত্মার শক্তির সম্পর্ক রয়েছে। এই ধারণার মধ্যে হিন্দু ধর্মীয় সংস্কার ও গ্রামীণ লোকবিশ্বাস একত্রিত হয়েছে।

(ঙ) ধীরেনের যুক্তিবাদ বনাম গ্রামীণ লোকবিশ্বাস: হলুদ পোড়ায় ধীরেন চরিত্রটি লোকবিশ্বাস এর বিপরীতে যুক্তিবাদী মনোভাবের প্রতিনিধি। দামিনীর অস্বাভাবিক অবস্থাকে সে প্রথমে রোগ হিসাবে দেখে এবং কৈলাস ডাক্তারকে ডাকার কথা বলে। কিন্তু গ্রামের অধিকাংশ মানুষ কুঞ্জগুনিনের উপর বেশি আস্থা রাখে। ধীরেনের যুক্তি গ্রামীণ লোকবিশ্বাস এর কাছে দুর্বল হয়ে পড়ে। এই দ্বন্দ্বটি গল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, একদিকে আধুনিক শিক্ষা ও যুক্তিবোধ অন্যদিকে দীর্ঘদিনের লোকবিশ্বাস ও কুসংস্কার- এই দুই মানসিকতার সংঘাতের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ সমাজের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

(চ) ক্ষেন্তিপিসি ও বাঁশের লোকবিশ্বাস: পরবর্তীতে ক্ষেন্তিপিসির মাধ্যমে লোকবিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রকাশিত হয়েছে। সে শান্তিকে একটি নতুন বাঁশ কেটে তার আগামাথা সামান্য পুড়িয়ে ঘাটের পথে ফেলে রাখতে বলে। কারণ হলো অশরীরী কোন কিছু সেই বাঁশ ডিঙিয়ে না আসতে পারবে না।

(ছ) সন্ধ্যা অন্ধকার ও অশরীরী শক্তির ভয়: গল্পে সন্ধ্যা ও রাতের সময় বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। শান্তি সন্ধ্যা হওয়ার আগেই বাড়ির সমস্ত কাজ শেষ করে ফেলে। অন্ধকার নামার পর সে বাইরে যেতে চায় না ও বাচ্চাদের ঘরের মধ্যে আটকে রাখে। তার ধারণা সন্ধ্যার পর পর অশরীরী শক্তির প্রভাব বেড়ে যায় এবং বলা হয় যে সন্ধ্যা হল মৃতের সঙ্গে জীবিতের যোগাযোগের উপযুক্ত সময়। এই বিশ্বাসের ফলে সন্ধ্যা সাধারণ সময়ের পরিবর্তে একটি রহস্যময় ও ভয়ংকর সময়ে পরিণত যা লোকজ সময়চেতনার গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।

(ঝ) খাবার ও লোকবিশ্বাস: শান্তির আচরণেও লোকবিশ্বাসের প্রভাব দেখা যায়। সে সন্ধ্যার আগেই রান্না ও খাওয়ার শেষ করে ফেলে। বিশেষ করে মাছ রান্না না করার একটি লোকবিশ্বাস গল্প পাওয়া যায়। তার ধারণা

অশরীরী আত্মাকে মাছের গন্ধ আকর্ষণ করতে পারে। ফলে খাদ্যাভ্যাসও এখানে কেবল স্বাভাবিক গৃহস্থালির বিষয় নয়; তা প্রচলিত বিশ্বাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এভাবে লোকবিশ্বাস মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্রতম আচরণকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে- এটাই দেখিয়েছেন লেখক।

(ঞ) লোক উপাদানের তাৎপর্য: 'হলুদ পোড়া' গল্পে ভূত পেত্নীর বিশ্বাস, অশরীরী শক্তি, গুনিনের ঝাড়ফুঁক, পাতা-শিকড় পোড়ানো, হলুদ পোড়ানো, মৃতের আত্মার ভর, শ্রাদ্ধ- শান্তি, সন্ধ্যার নিষেধ, বাঁশ পোড়ানো, খাদ্য সংক্রান্ত বিশ্বাস- এসব উপাদান মিলে একটি সমৃদ্ধ লোকবিশ্বাসের জগৎ তৈরি করেছে। গল্পে এ উপাদানগুলি কেবল পরিবেশ নির্মাণের উপকরণ নয় বরং কুসংস্কার ও যুক্তিবাদের দ্বন্দ্ব প্রকাশ করার একটি শক্তিশালী মাধ্যম।

আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে আমরা দেখতে পাই আলোচ্য তিনটি গল্প- 'পুঁইমাচা', 'ডাইনি', 'হলুদ পোড়া'য় লোক উপদান কাহিনীর অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লোক উপাদানের মাধ্যমে গ্রামীন জীবনের মানবিক ও প্রকৃতি নির্ভর রূপ তুলে ধরেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লোক উপাদানের মাধ্যমে লোকবিশ্বাস ও কুসংস্কারের স্বাভাবিক অভিঘাতকে গুরুত্ব দিয়েছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লোকচিকিৎসা, তন্ত্র-মন্ত্র ও লোকবিশ্বাসকে মনস্তাত্ত্বিক ও বাস্তববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। মোদ্দাকথা, তিনজন লেখকের রচনায় লোক উপাদান বাংলা কথাসাহিত্যের বাস্তবতাকে আরো বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে এবং প্রমাণ করেছে যে লোক উপাদান বাংলা ছোটগল্পে কেবল সাংস্কৃতিক পরিচয় এর বাহন নয়; এটি সমাজ সমালোচনা মানবিকতা এবং শিল্প সৃষ্টিরও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

সহায়ক গ্রন্থাপঞ্জি:

১. মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার। কালের পুত্তলিকা: বাংলা ছোটগল্পের নব্বই বছর, ১৮৯১-১৯৮০। কলকাতা দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮২।
২. সিদ্দিকী, আশরাফ। লোকসাহিত্য। ঢাকা, গতিধারা প্রকাশনী, ১৯৬৩।
৩. সেন, সুকুমার। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। ১-২ খন্ড, কলকাতা, সাহিত্য আকাদেমি, ১৯৬৫।
৪. ভট্টাচার্য, আশুতোষ। বাংলার লোকসাহিত্য। ৬ খন্ড, কলকাতা, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৮২।
৫. সেন, দীনেশচন্দ্র। The folk literature of Bengal. Calcutta: University of Calcutta, 1920.